১০

খাদ্যের অধিকার

খুশি কবীর ও রেজানুর রহমান

বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, সরকারি ভূমি, পানি ও বনজ সম্পদ চরম দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকজনের খাদ্যের উৎস। আর এসব উৎস ও তা ব্যবহারের সুযোগ সংক্রান্ত অনেক আইন ও অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। কাজেই 'খাদ্য অধিকার' বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বোঝা জরুরি। এই অধ্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতাসহ ২০০৮ সালের খাদ্য অধিকার পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা কমিটি গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুকে তুলে ধরা। ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে এই কমিটি খাদ্যপ্রাপ্তি, প্রবেশগম্যতা ও স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য নিরাপত্তা শনাক্ত করে এবং ছয়টি সূচক প্রতিষ্ঠা করে। এই সূচকগুলো ওঠানামা করে বিশ্ব খাদ্যশস্য বাজার পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন পরিমাপ করতে হবে এ দেশের কৃষিকর্ম ও খাদ্য ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় এনে। কারণ এই ব্যবস্থায় খাদ্য আমদানি ও রফতানি আয়ের সাথে এখানকার অর্থনীতি সরাসরি সম্পৃক্ত।[১]

খাদ্য সার্বভৌমত্ব

---

1 ewYR¨ cbMVb I Lv`¨ wbivcËv †_‡K Awf‡hvRb : avivYv msµvš— wj‡¼R¸‡jv, GdGI, †ivg, 2003|

জনগণ, সম্প্রদায় ও দেশের মানুষের খাদ্য অধিকারের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে খাদ্য সার্বভৌমত্ব ধারণার প্রতিষ্ঠা করা হয়। খাদ্য উৎপাদন, মাছ ধরার অধিকার ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবেই মানানসই। খাদ্য সার্বভৌমত্ব একই সাথে মানুষের খাদ্যের অধিকার ও উৎপাদকের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি বিশেষ মানদণ্ড মেনে চলে :[২]

- জনগণের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উৎপাদনের স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দেয়া;
- কৃষকের অধিকার এবং ভূমি, পানি, বীজ ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধায় তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
- নিজের খাদ্য নির্বাচনে ভোক্তার স্বাধীনতা থাকা;
- কৃষিনীতি পছন্দের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ থাকা;
- নারী কৃষকদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া।

খাদ্য অধিকার

পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার বলতে স্বাধীনতা ও অধিকার দুটিই বোঝায়। এখানে স্বাধীনতা ক্ষুধামুক্তির প্রতীক আর অধিকার বলতে বোঝায় খাদ্য অধিকার যা পুষ্টির জোগান দেয়, যা সম্পদের প্রাচুর্য থেকে মুক্ত, যা সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, যা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, যা শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রবেশযোগ্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যার উৎপাদন টিকে থাকবে।[৩]

‘খাদ্য নিরাপত্তা’ ধারণাটি কৌশলগত। আর ‘খাদ্য সার্বভৌমত্বে’র ধারণা রাজনৈতিক। ‘খাদ্য অধিকার’ হলো একটি আইনগত ধারণা। খাদ্য সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক ধারণাটি অবশ্যই আইনি ধারণা খাদ্য অধিকার দ্বারা শক্তিশালী করতে হবে।

জাতীয় বাধ্যবাধকতার পর্যালোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান : দ্বিতীয় ভাগ

অনুচ্ছেদ ১৩ : মালিকানার নীতি– উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন

২ www.un-ngls.org/UNCTAD

৩ মারিয়া সোকোরো ১.ডিয়ায়োকনো, দি রাইট টু অ্যাডেকিউয়েট ফুড ইন ফিলিপাইন ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশন্স।

প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিুরূপ হইবে:

ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

খ. সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

গ. ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

অনুচ্ছেদ ১৪ : কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি– রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে– কৃষক ও শ্রমিকের– এবং জনগণের অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

অনুচ্ছেদ ১৫ : মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা– রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিুলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

ক. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

খ. কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

গ. যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ১৬ : গ্রামীণ উন্নয়ন ও বিপ্লব– নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ : জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা–

১. জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন

কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯ : সুযোগের সমতা–

১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২০ : অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম–

১. কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী'– এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

২. রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক– সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান : তৃতীয় ভাগ

অনুচ্ছেদ ৩২ : জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ– আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক নাগরিক অধিকার। এই পঞ্চ অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। অন্যদিকে এই পাঁচ মৌলিক অধিকার, যেগুলোকে সংবিধানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তা আদায়ের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার সংবিধানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সংবিধানে বাধ্যবাধতা রয়েছে।

২০০৬ সালের জাতীয় খাদ্যনীতি

নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো :

১. নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকভাবে সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়া।

২. মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩. সবার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তা দেয়া (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের

জন্য)।[4]

আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা

নিরূপ বিভিন্ন চুক্তি, সমঝোতা এবং জাতিসংঘের দলিলগুলোর খাদ্য অধিকার ও মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

১. সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউডিএইচআর), অনুচ্ছেদ ২৫।[5]

২. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিইএসসিআর), অনুচ্ছেদ ৬, প্যারা-১;[6] *অনুচ্ছেদ-৬, প্যারা-২;*[7] *অনুচ্ছেদ-৬, প্যারা- ৩;*[8] *অনুচ্ছেদ-৬, প্যারা-৪।*[9]

৩. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিসিপিআর), অনুচ্ছেদ-১।[10]

৪. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি (সিডও), অনুচ্ছেদ-১২, প্যারা- ২;[11] *অনুচ্ছেদ-১৪জি।*[12]

৫. শিশু অধিকারের বিষয়ে সনদ (সিআরসি), অনুচ্ছেদ-২৪, প্যারা-২সি;[13] *অনুচ্ছেদ ২৭, প্যারা-৩।*[14]

---

৪ জাতীয় খাদ্যনীতি, অংশ-বি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ১৪ আগস্ট ২০০৬।

৫ 'প্রত্যেকের মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে, প্রত্যেকে নিজের ও তার পরিবারের জন্য উৎকৃষ্ট অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

৬ রাষ্ট্রপক্ষ কোনো ব্যক্তির ও তার পরিবারের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত করবে।

৭ রাষ্ট্র তার সব নাগরিককে ক্ষুধামুক্ত রাখার মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেবে।

৮ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ পদ্ধতির উন্নয়ন করতে হবে।

৯ খাদ্য আমদানিকারক ও রফতানিকারক দেশগুলোর সমস্যা গ্রাহ্যে আনতে হবে, যাতে প্রয়োজনমতো বিশ্ব খাদ্য সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিত করা যায়।

১০ প্রত্যেক মানুষের বাঁচার অধিকার আছে। এই অধিকার আইন প্রয়োগে রক্ষা করতে হবে। কোনো লোকই তার জীবন থেকে বঞ্চিত হবে না।

১১ রাষ্ট্রপক্ষকে নারীদের মাতৃত্বকালীন, সন্তান প্রসবের জন্য বাইরে যেতে না পারার অবস্থায় এবং সন্তান প্রসব-পরবর্তী সময়ের প্রয়োজনীয় ফ্রি চিকিৎসা সেবার নিশ্চিত করতে হবে। অন্তঃসত্ত্বা ও স্তন্যদানকারী নারীর পর্যাপ্ত পুষ্টির ব্যবস্থাও করতে হবে।

১২ কৃষিঋণ, ভর্তুকি, বাজারজাতকরণ সুবিধা, সময়োপযোগী প্রযুক্তি সুবিধাসহ ভূমি পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা করতে হবে।

১৩ রাষ্ট্রপক্ষকে শিশু অধিকার স্বীকৃতি দিতে হবে, শিশুদের রোগ মোকাবেলায় ও অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবাসহ পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে।

১৪ রাষ্ট্রপক্ষকে, জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে, প্রয়োজনে, পুষ্টি, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যাপারে কাঁচামাল সরবরাহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে।

৬. জীববৈচিত্র্য বিষয়ে সনদ, অনুচ্ছেদ- ৮;[১৫] অনুচ্ছেদ-১০: জীববৈচিত্র্যের উপাদানগুলোর স্থিতিস্থাপক ব্যবহার।[১৬]
৭. বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে রোম ঘোষণা।[১৭]

জরুরি অবস্থার অধীনে খাদ্য অধিকার

একটা দেশের নাগরিকদের খাদ্য সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব, সরকার খাদ্যসামগ্রী কিনে, মজুদ রেখে, বাজার স্থিতিশীল রাখবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো দুর্যোগে নাগরিকদের এগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে। এ কর্তব্যে সরকারের কোনো অংশের অবহেলা মানুষকে খাদ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ২০০৮ সালে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা মারাত্মক ছিল তা খোদ সরকারের দেয়া পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায়। ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত (জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগ পর্যন্ত) দাবি করা হয়, সরকার ৬ দশমিক ৮৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য কিনে এবং মজুদ রাখে ৭ দশমিক ১৫ লাখ মেট্রিক টন। কিন্তু জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর (২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত) সরকারের খাদ্যসামগ্রী কেনা ও মজুদ রাখার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ২.৬৮ ও ৬.৬৯ লাখ মেট্রিক টন।[১৮] এ সময় অধিকাংশ লোক তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিদিনের ন্যূনতম খাদ্য যোগাড় করতেই হিমশিম খেয়েছে। বাজারে খাদ্যসামগ্রী সহজলভ্যতা সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃত আয় ভয়াবহ রকমে কমে যাওয়ায়, অধিকাংশ লোকের খাদ্যসামগ্রী কেনার মতো যথার্থ সামর্থ্য ছিল না। ড. আবুল বারকাতের এক গবেষণায় দেখা

---

১৫ প্রত্যেকটি চুক্তিবদ্ধ পক্ষকে যতদূর সম্ভব যথাযথ হতে হবে : জাতীয় আইনের সংলগ্নতা, আইনের প্রতি সম্মান, জ্ঞান সংরক্ষণ, উদ্ভাবন ও আদিবাসীদের জীবনাচার, ঐতিহ্যবাহী জীবনব্যবস্থা যা জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করে, বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগাতে হবে।

১৬ প্রত্যেকটি চুক্তিবদ্ধ পক্ষকে যতদূর সম্ভব যথাযথ হতে হবে : ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চা অনুযায়ী জীববৈচিত্র্যের সম্পদ রক্ষা সুরক্ষা করতে হবে। যাতে ওই সম্পদগুলোর টিকে থাকা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

১৭ এই ঘোষণা পর্যাপ্ত খাদ্য অধিকার ও ক্ষুধামুক্ত হতে অন্যান্য মৌলিক অধিকার অর্জনে সহায়ক মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয় যাতে এ লক্ষ্য অর্জনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

১৮ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ২০০৭ (অর্থ মন্ত্রণালয়) : বাংলাদেশ ব্যাংকের মাসিক তথ্য সংশোধন ও সংযোজন মার্চ ২০০৮, ডেমোক্রেসি কনস্টিটিউশন ক্রাইসিস: কান্ট্রি টু হুইচ ডিরেকশন, ২৩ এপ্রিল ২০০৮।

যায়, গত দেড় বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম প্রকৃতিভেদে শতকরা ৩০ থেকে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ (সরকারের দাবি সর্বোচ্চ স্ফীতির হার শতকরা মাত্র ১২ ভাগ) বাংলাদেশের ইতিহাসে মুদ্রাস্ফীতির এই হার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বেকার সমস্যা, প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ভয়াবহ হারে বেড়ে যাওয়ার ফলে ওই সময় সারা দেশের অন্তত সাত কোটি মানুষ খাদ্য সঙ্কটের শিকার হয়; তিন থেকে চার কোটি লোকের একবেলা খাবার জুটলে, পরবর্তী বেলা তা মিলবে কিনা তা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।[১৯] ২০০৮ সালের আগস্টে প্রকাশিত এফএও (বিশ্ব খাদ্য সংস্থা) এবং ডব্লিউএফপির (বিশ্ব খাদ্য পরিকল্পনা) বিশেষ প্রতিবেদনে খাদ্য সঙ্কটের তীব্রতর রূপ ধরা পড়ে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার লোকদের 'চরম দরিদ্র', 'নিরেট দরিদ্র' এবং 'অতি দরিদ্র' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এই লোকগুলো সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে প্রতিদিন গড়ে ২,১২২ কিলোক্যালরির কম পায়। নিয়মিত খাবার পায় না এমন পাঁচ কোটি ৬০ লাখ লোক খাদ্যাভাবে আছে। অন্যদিকে বড় পরিবারগুলোর (পাঁচজন কিংবা ততোধিক সদস্য) অধিকাংশই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় আছে নারী কর্তৃত্বাধীন পরিবারগুলো। গ্রামাঞ্চলের লোকদের একটা অংশ দীর্ঘদিন ধরে এবং সাময়িকভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার ধারাবাহিকভাবেই হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পেছনে রয়েছে নানা কারণ : কৃষি ভূমিতে প্রবেশাধিকার কম থাকা, কর্মের সুযোগ না থাকা, ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প থেকে বাদ পড়া এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ধারণা করা হয়, বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তাহীন লোকের সংখ্যা অন্তত ৬ কোটি ৫৩ লাখ, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এ সংখ্যা ৭৫ লাখ বেড়েছে। অনুরূপভাবে ভয়াবহ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা লোকদের সংখ্যাও বেড়েছে অন্তত ৬৯ লাখ; মোট সংখ্যা ২ কোটি ৭৯ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৪৭ লাখ। ফলে দেশের মোট প্রায় ১৪ কোটি ৫০ লাখ লোকের অর্ধেকই (শতকরা ৪৫ ভাগ) খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে (প্রতিদিন গড়ে জনপ্রতি ২১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণ করে) এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক

১৯ 'ডেমোক্রেসি কনস্টিটিউশন ক্রাইসিস : কান্ট্রি হুইচ ডিরেকশন', মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ড. আবুল বারকাত, এপ্রিল ২০০৮ ঢাকা, কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব প্রফেশনালস আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক, ২৩ এপ্রিল ২০০৮।

(২৩.৯ ভাগ) ভয়াবহরকমে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার (প্রতিদিন গড়ে জনপ্রতি ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম গ্রহণ করে)।[২০]

উচ্ছেদ, বেকারত্ব ও ক্ষুধা

জনগণ প্রতিবাদ করতে পারেনি

'উন্নয়ন' ও 'শৃঙ্খলা'র নামে গরিব লোকজনের জীবিকার উৎস ও কাজের সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

- জরুরি অবস্থা জারি ও সরকারের নীতির কারণে গত এক বছরে ৫০ হাজার কারখানা ও শ্রমশিল্প (বৃহৎ ও মাঝারি) বন্ধ হয়ে গেছে, আরো ৫০ হাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এতে চাকরি হারিয়েছে অন্তত এক কোটি লোক।
- দেশের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসা ও হকার উচ্ছেদ করায় কর্মহীন হয়ে পড়ে ২০ লাখ লোক। এ উচ্ছেদ চালানো হয় ঢাকা ও অন্যান্য শহরসহ প্রত্যন্ত গ্রামের ছোটখাটো বাজারেও।
- নির্মাণ শিল্পে ধস নামায় কাজ হারায় ৭০ থেকে ৮০ লাখ লোক।
- হাঁস-মুরগির খামারে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ায় কাজ হারায় ৫ লাখ লোক।
- সিডরের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় অন্তত ৫ লাখ লোক তাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।
- জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে 'ভীতিজনিত' কারণে বিনিয়োগ কমে যায়। এতে ধারণা করা হয়, ১৪ কোটি লোকের আয় কমেছে এবং অন্তত ৪ কোটি লোক বেকার হয়ে পড়েছে।[২১]

খাদ্য চাহিদা ও উৎপাদন :

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ২০০৭-০৮ সাল

বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের মূল উৎস এ দেশের কৃষকরা। তিনটি প্রধান খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন ও চাহিদার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে খাদ্য বিষয়ে দেশের বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যাবে।

---

২০ বিশেষ প্রতিবেদন : এফএও/ডব্লিউএফপি, বাংলাদেশে শস্য ও খাদ্য সরবরাহ মূল্যায়ন মিশন, আগস্ট ২০০৮।

২১ 'গণতন্ত্র ও সংবিধানের সঙ্কট : দেশ কোন দিকনির্দেশনায় দিকে যাচ্ছে,' মুল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ড. আবুল বারকাত, কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল অব প্রফেশনালস্ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮।

সারণি ১০.১ : প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন ও চাহিদা[২২]

বর্ণনা	চাহিদা (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	উৎপাদন (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
চাল	২৭-২৭.৫	২৮
গম	২.৪-২.৫	১
আলু	৫-৬	৪.৫

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জাতীয় চাহিদার তুলনায় গম উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে কিন্তু চাল ও আলুর ফলন জাতীয় চাহিদার চেয়ে বেশি। এতে প্রমাণিত হয়, খাদ্য উৎপাদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে আরো বোঝা যায়, অধিকাংশ কৃষকই প্রয়োজনীয় খাদ্যের সামান্যই মজুদ রাখতে পারে।

ভূমি মালিকসহ অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের ঋণ শোধ করার পর একজন কৃষক তার উৎপাদিত ধান আর মজুদ রাখতে পারে না বললেই চলে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, খাদ্যসামগ্রীগুলো যায় কোথায়? যদি চালের মূল্য হয় আকাশছোঁয়া, কৃষক কেন ন্যায্যমূল্য পায় না? এই কৃষকদের, উৎপাদকদের খাদ্য অধিকার রক্ষায় সরকার কী ভূমিকা পালন করেছিল? এই খাদ্য বঞ্চনার কার্যকারণ সম্পর্ক চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কোনো একটি মাত্র কারণে ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে না। বর্তমানে খাদ্য অনিরাপত্তার নেপথ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, মানুষের অধিকার লঙ্ঘন, বঞ্চনা ও বৈষম্য।

২০০৮ সালে জনগণের খাদ্য অধিকার লঙ্ঘনের ধরন আগের সময়ের তুলনায় প্রধানত দুই কারণে ভিন্নরকম। প্রথমত, জরুরি অবস্থার কারণে জনগণ তাদের চাহিদার কথা প্রকাশ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ লোকজন চাহিদার কথা বলতে না পেরে এক ধরনের নিস্পৃহ ও হতাশ হয়ে পড়ে। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকারণ সম্পর্কে সরকারকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে প্রশাসনিক ম্যাকানিজমের।

কৃষি রূপান্তর

বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা ঐতিহ্যগতভাবেই বহুমাত্রিক। এই অবস্থা এ দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এর অর্থ, একসময় অধিকাংশ লোকই

২২ বিবিএস, ২০০৮

তাদের চাহিদার ন্যূনতম খাদ্য পেত। কিন্তু ক্রমে ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি জমিতে কলকারখানা তৈরির ফলে এ দেশের ঐতিহ্যগত খাদ্য সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কৃষকদের অনুকূলে যায় এমন ভূমিনীতির অভাব রয়েছে। ফলে অবৈধভাবে কৃষি জমি ও পানি সম্পদ ব্যবহারের প্রচলন ঘটে। এতে প্রতিষ্ঠা পায় জোর যার মুল্লুক তার নীতি। প্রান্তিক চাষিরা বৈষম্যের শিকার হয়, কোণঠাসা হতে হতে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। তারা জীবন নির্বাহী খাদ্যশস্য উৎপাদনের সুযোগ হারায়।

রাজস্ব আয় বণ্টন কমে যাওয়ায় কৃষিখাতে ভর্তুকি ও অন্যান্য সহযোগিতা কমে আসে। ১৯৭০-৭১ সালে এর হার ছিল শতকরা ৩১ ভাগ, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ১.২ ভাগ।[২৩] এর পেছনে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপত্র। যদিও সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হতো 'স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসি'র মাধ্যমে। একই সময়ে সার, বীজ, সেচে সহায়ক ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ আমদানি জোগান কমিয়ে আনা হয় শতকরা ২৫ ভাগে (১৯৯২-৯৩ সালে তা ছিল ৩০০%)।[২৪] কৃষিকাজে সহায়ক পণ্য কৃষকদের কাছে কম দামে সরবরাহের জন্য সরকার বিএডিসিকে বেসরকারিকরণের চেষ্টা চালায়। ফলে শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদককে এখন সম্পূর্ণভাবে বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর এ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা, যারা এমন সব ব্যক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়। আবশ্যিকভাবেই এর প্রভাব পড়েছে ভোক্তাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী চড়ামূল্যে কেনার ওপর, আর উৎপাদকরা পেয়েছে কম মূল্য এবং এসব ব্যাপার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় প্রভাব ফেলেছে।

ভূমি ও জলাশয় থেকে উচ্ছেদ

খাসজমি, খাস জলাশয় ও সরকারি বনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের একদল হতদরিদ্র মানুষ তাদের জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সর্বসাধারণের ভোগ্য এই সম্পদ ও সম্পত্তি তাদের জীবন ও জীবিকার উৎস। কিন্তু আগে যেমনটি বলা হয়েছে, সরকারের দারিদ্র্যমুখী নীতির অভাবে এসব সর্বসাধারণ্যের ভোগ্য ভূমি, জলাশয় ও অরণ্য ভোগ করছে বিত্তবানরাই। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও সরকারের বিত্তবান তোষণ-নীতির কারণে চরম দরিদ্র জনগণ আরো সঙ্কটে পড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট খাসজমির শতকরা ৮৮ ভাগ ও মোট

২৩ আইএফআই ওয়াচ বুলেটিন।
২৪ *প্রাগুক্ত।*

জলাশয়ের শতকরা ৯৫ ভাগই সমাজের 'এলিট' শ্রেণী ও অন্য ক্ষমতাধরদের ভোগদখলে রয়েছে।[২৫]

যদিও দরিদ্র এসব জনগোষ্ঠীর জন্য কতিপয় কার্যক্রম ও নীতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু বাস্তবে সরকার তাদের স্বার্থের নিশ্চয়তা বিধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। খাসজমি, খাস জলাশয় ও সরকারি বনভূমি থেকে গত বছর হাজার হাজার দরিদ্র পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর অর্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এসব সরকারি সম্পত্তিতে তাদের অধিকার হারিয়েছে, অথচ এগুলোই তাদের খাদ্যের প্রধান উৎস।

২০০৭-০৮ সালে এ দেশের পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় এমন সব খবর প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে যেগুলোতে দেখা যায় খাসজমি, জলাশয় ও বনাঞ্চল রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সরকারের প্রতিনিধি ও অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সর্বসাধারণের ভোগ্য এসব সম্পত্তিতে চলেছে অরাজকতা সর্বসাধারণের অধিকার করা হয়েছে খর্ব। কাজেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য গেছে বেড়ে। ধনী আরো ধনী হয়েছে, গরিবরা হয়েছে নিঃস্ব। ক্ষমতা হয়ে পড়েছে ভারসাম্যহীন। পরিণামে গরিব লোকের দুঃখ-দুর্দশা বেড়েছে।

কৃষি ভূমির বাণিজ্যিকীকরণ

কৃষি ভূমির বাণিজ্যিকীকরণের ফলে প্রান্তিক চাষি, ক্ষুদ্রচাষি ও বর্গাচাষিরা তাদের নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের অধিকার হারাচ্ছে। কৃষি শ্রমিকরা হয়ে পড়ছে বেকার। জীবিকা রয়েছে হুমকির মুখে। কৃষি শ্রমিকরা খাদ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

২০০০-০১ সালে উচ্চ ফলনশীল শস্যের আবাদ হ্রাস পায় ৫ লাখ ৬৫ হাজার একর, ২০০৬-০৭ সালে গম ও কলাই জাতীয় শস্যের আবাদ হ্রাস পায় যথাক্রমে ৯ লাখ ২১ হাজার ও ৪ লাখ ১ হাজার একর। অন্যদিকে তামাক চাষের জমি ২ হাজার একর বৃদ্ধি পায়, ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে ২ লাখ ৩৬ হাজার একর ও বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষের জন্য ১৯ লাখ ১ হাজার ৭৮৮ একর বৃদ্ধি পায়।[২৬]

১৯৯৬ সালের কৃষিশুমারি অনুযায়ী, প্রতি বছর ৮২ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে (মোট কৃষিজমির শতকরা ১ ভাগ) ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো

---

২৫ ড. আবুল বারকাত, ল্যান্ড, 'এগ্রিকালচার এ্যান্ড এ্যাকুরিয়াম রির্ফম ইন বাংলাদেশ : দি মোস্ট আনরিসলভড্ পলিটিকো-ইকোনমিক ইস্যু ইন দি ক্রিমিনালইজড স্ট্রাকচার', *বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি*, ইকোনমিক অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫।

২৬ বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেটবুক ২০০৭, বিবিএস।

নির্মাণ করা হয়। যার অর্থ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২২৫ হেক্টর কৃষিজমি হারাচ্ছে। যদিও ২০০৮ সালে তা ঘটেনি, কিন্তু কৃষিজমি উজাড় হওয়ার এই প্রবণতা ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী।[২৭] এর ফলে প্রতি বছর ১২ থেকে ১৫ লাখ লোকের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে।

কৃষিজমিতে চিংড়ি চাষ

সাধারণ মানুষ খাবার জোটাতে পারছে কিনা– এ ব্যাপারে ক্ষমতাধর ভূমিদস্যু কিংবা চিংড়িচাষি এমনকি সরকারের মাথাব্যথা নেই। স্থানীয় লোকদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভকে পাত্তা না দিয়ে এবং উপকূলের ঐতিহ্যবাহী জেলে ও সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল লোকদের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়কে অবজ্ঞা করে চিংড়ি শিল্পনীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। চিংড়ি চাষ ফুলে-ফেঁপে উঠছে, তাছাড়া লাক্সারি ও চমকপ্রদ এই খাদ্যবস্তুটি বিদেশে রফতানিও হয়। বিদেশে চিংড়ির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার এর চাষে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে। আর এই চিংড়ি চাষের সুবাদে উপকূলীয় অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ন্যায়সঙ্গত খাদ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উর্বর কৃষিজমিতে চিংড়ি চাষের ফলে কৃষিকাজ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ হুমকির মুখে রয়েছে। ম্যাংগ্রোভ বন উজাড় করে চিংড়ি ঘের করায় সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ছে উপকূলবাসী। সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহ সিডরের আঘাত তারই উদাহরণ। বিপুলসংখ্যক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে, তাদের খাদ্য সার্বভৌমত্বের কথা সরকার এড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল বেশ উর্বর। এই উর্বর ভূমিকে ঘিরে বাস করে প্রায় ২ কোটি লোক। নির্মম বাস্তবতা হলো, উপকূলীয় অঞ্চলের এই লোকগুলোর বিরাট একটা অংশের নেই নিজস্ব ভূমি, নেই কাজ, ফলে আহার জুটে না, উপোস দিতে হয় তাদের। ক্ষুধা এই লোকগুলোর পিছু ছাড়ে না। এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রের একজন গবেষক ড. মনোরঞ্জন মণ্ডল। লবণাক্ত এই ভূমিতে কীভাবে ধান জন্মানো যায় গত ২০ বছর এই গবেষণাই ড. মণ্ডল করছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষ বেড়েই চলেছে। ওইসব অঞ্চলে লবণাক্ততা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশঙ্কা হয়, আগামী চার থেকে পাঁচ বছর পর ওইসব এলাকা হয়তো চিংড়ি চাষেরও উপযোগিতা হারাবে, শস্য ফলানো তো যাবেই না। প্রতি বছর চিংড়ি রফতানি থেকে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু স্থানীয় লোকদের দাবি, একই পরিমাণ

---

২৭ আব্দুল বায়েস এবং মাহবুব হোসেন, *রুরাল পিপল রুরাল ইকোনমি : রিভিউ অব চ্যাঞ্জেস ইন লাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুড*, ২০০৮।

জমিতে বছরে তিনবার শস্য ফলিয়ে প্রতি বছর ৩০ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব।[২৮] আর তাতে খাদ্য সার্বভৌমত্বও রক্ষা পায়। ২০০৮ সালে বহু বিক্ষোভ হয়েছে, কিছু কিছু এলাকায় লোকজন চিংড়ি ঘের উঠিয়ে দিয়ে বছরে তিনবার ফসল ফলিয়েছে।

মানুষের জীবিকার ওপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব

মানুষের খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করার প্রশ্নে, চূড়ান্ত ফল পেতে হলে দরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো এবং মানুষের আয় বাড়ানো। কিন্তু তা সম্ভব কিনা নিশ্চয়তা নেই। চরম অনিশ্চিত। নিচের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে অন্তত তাই ধরা পড়ে।

বিআইডিএসের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত আয় জাতীয় পর্যায়ে শতকরা ৩.৯৫ ভাগ, কৃষক পর্যায়ে ৪.৬ ভাগ, কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকরণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২.৩৭ ভাগ, নির্মাণ শ্রমিকদের ৪.৪০ ভাগ কমেছে।[২৯]

শহর ও গ্রামাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ায়, ভোক্তারা ভোগ্যপণ্য কেনা কমিয়ে দিয়েছে (চাল শতকরা ২২.২ ভাগ, ভোজ্যতেল শতকরা ৪১ ভাগ, ডাল জাতীয় খাদ্য ৪২ ভাগ)। উপরন্তু পুষ্টিকর ও গুণসম্মত খাদ্যের অভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শতকরা ৮৭ ভাগ শিশু স্বাস্থ্য সমস্যার কবলে পড়ে (এই নমুনা তথ্যের মোট সংখ্যা ছিল ২৫০)।[৩০]

আবার দেখা যায়, কোনো পরিবারের সব সদস্য খাদ্য গ্রহণের বেলায় সমান ভাগ পায় না। এখানে রয়েছে বৈষম্য। জরিপে অংশ নেয়া শতকরা ৬৩ ভাগ পরিবারে[৩১] এ বৈষম্য ধরা পড়ে, নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম খাবার পায়। শহর ও গ্রামাঞ্চলভেদেও খাদ্য গ্রহণের এ তারতম্য রয়েছে। শহরের নারী ও শিশুদের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের নারী ও শিশুরা খাবার কম পায়, খাদ্য ঘাটতির বড় ধরনের শিকার হয় অন্তঃসত্ত্বা ও নতুন মায়েরা।[৩২]

সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা

২৮ 'চিংড়ি চাষ বনাম তিন-শস্য চাষবাস', *প্রথম আলো*, ৭ জানুয়ারি, ২০০৮।

২৯ bangladeshnews.com.bd (লেবার মার্কেট ইন বাংলাদেশ চেঞ্জেস, ইনেকুয়্যালিটিজ এ্যান্ড চ্যালেঞ্জস, বিআইডিএস ২০০৭)।

৩০ উন্নয়ন সমন্বয়, বাংলাদেশ ইকোনমিক আউটলুক ভলিয়্যুম-২, নং-১, সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৩১ *প্রাগুক্ত।*

৩২ *প্রাগুক্ত।*

সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা মোকাবেলায় সরকার মাঝে মধ্যে নতুন ধরনের উদ্যোগ নেয়। ২০০৮-০৯ সালের বাজেটে সরকার সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে। এতে বোঝা যায়, জনগণকে বড় ধরনের সঙ্কট, ক্ষুধা ও বঞ্চনার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা সেক্টরে শতকরা ৮.২ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি।

এই খাতে বড় ধরনের বরাদ্দের ফলে জনগণের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, এটা স্পষ্ট। এই নতুন নিরাপত্তা কর্মসূচির কারণে যে লোকগুলো ইতোমধ্যে খাদ্য অধিকার বঞ্চিত, তাদের অবস্থা আরো সঙ্কটময় হয়ে উঠবে। তাছাড়া খাদ্য অধিকার বঞ্চিত হওয়ার এই পীড়াদায়ক সত্য জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়তে পারে।

যাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ বেড়েছে

- মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
- বয়স্কভাতা
- মাতৃত্বকালীন ভাতা
- অসহায় পঙ্গুদের জন্য ভাতা

১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি : কাজের ধরন

১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বাজেটে ৫২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে স্থানীয়ভাবে ২০ লাখ বেকার লোক কাজ করার সুযোগ পাবে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এ উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে, মানুষের কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি এখানে, বরং কয়েক মাসের কাজের নিরাপত্তার জাল বিস্তৃত করা হয়। আরো জট পাকায়– ২০ লাখ বেকার লোক কোন বিবেচনায় চিহ্নিত করা হবে, এ ব্যাপারে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। ফলে আশঙ্কা দেখা দেয় এই কর্মসূচির আওতায় প্রকৃত বেকাররা আসবে কিনা, অনিশ্চিত থেকে যায় এ উদ্যোগের ফলে দরিদ্র লোকের ক্ষুধা দূর হবে কিনা, খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে কিনা, এ ব্যাপারে। এ কর্মসূচি পরিচালনার সিংহভাগ দায়িত্ব দেয়া হয় ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে, ধারণা করা হয় এতে মাঠ পর্যায়ে দায়দায়িত্ব নিশ্চিত করা যাবে; কিন্তু তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বাস্তব চিত্র এই আগাম ধারণার সঙ্গে যায় না। কোথাও কোথাও স্বজনপ্রীতি হয়েছে, হিসেবে গড়বড় হয়েছে। ‘নিজেরা করি’ শ্লোগান নিয়ে এই ১০০ দিনের কাজ সৃষ্টি কর্মসূচির প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তৃণমূল পর্যায়ে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা

বিভাগের ১৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার ৮৫টি ইউনিয়নকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয় এবং ওইসব এলাকার মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৮৫টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ১১টিতে ১০০ দিনের এই কাজ সৃষ্টি কর্মসূচির কথা প্রদর্শন করা হয়, আটটি ইউনিয়নে এ ব্যাপারে লোকজনকে আগেভাগে জানানো হয় এবং ৮টি ইউনিয়নে কাজ পাইয়ে দেয়া হয় সুবিধাভোগীদের।

তিনটি ইউনিয়নের স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে অবৈধভাবে টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। অনিয়ম, জবাবদিহিতার অভাব, জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অস্বচ্ছতা, অবৈধভাবে টাকা হাতিয়ে নেয়ার নানা অভিযোগ থেকে সংশয় জাগে এ কর্মসূচি কতটা সফল হবে, প্রকৃত গরিব জনগণ কতটা উপকৃত হবে, এ ব্যাপারে। গরিব লোকদের সত্যিকার অর্থে এ প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা দিতে চাইলে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

জনগণের খাদ্য অধিকার, নিয়মতান্ত্রিক সংস্কার এবং জনগণের ক্ষমতায়ন

'খাদ্য অধিকার' নিরাপত্তা একটি ব্যাপক ধারণা, এটি অনুধাবনের সঙ্গে মৌলিক নীতির পুনর্গঠনের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বর্তমান সরকারের নীতি এ দেশের সংবিধানে বর্ণিত খাদ্য অধিকারের সঙ্গে যায় না, দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে খাদ্য অধিকার এবং খোলাবাজার নীতি পরস্পরবিরোধী। পণ্যবাজার অথবা শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রিত হয় তথাকথিত বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে। তাই জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া কিংবা খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাজারের কিছুই করার থাকে না। মানবাধিকার নিশ্চয়তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপস্থিতির সংযোগ রয়েছে। যখন মানুষের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হয়, তখন জীবন ও জীবিকা সঙ্কটও প্রকট হয়ে ওঠে।

২০০৭ থেকে ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া দাম বেড়ে যাওয়ার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ে, আর গরিব লোকদের ওপর এর প্রভাব আমাদের বেশি করে মনে করিয়ে দেয় কঠিন বাস্তবতার কথা, নেতিবাচক ও অপ্রীতিকর দিকের কথা। মানুষের খাদ্য অধিকার, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে এক্ষেত্রে নীতির মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। বাজার নিয়ন্ত্রণে মানুষের নিরাপত্তা ইস্যুকে

এড়িয়ে যাওয়া হবে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বিবৃত বিষয়াবলির সুপারিশমালা অধ্যায়ে বর্ণিত এ সংক্রান্তসুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

অনুবাদ : মিজান মল্লিক